Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 189 – 196
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

দেবব্রত চৌধুরীর ছোটগল্পে প্রান্তিক জীবন

সুবীর গোস্বামী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : gsubir94@gmail.com

Keyword
বাংলা ছোটগল্প, বরাক উপত্যকা, দেবব্রত চৌধুরী, অপর অস্তিত্ব, সময়, ব্রাত্য, সমাজ, প্রান্তিক জীবন, আশার ইঙ্গিত।

Abstract
বরাক উপত্যকায় বাংলা ছোটগল্পের চর্চা শুরু হয় মূলত ছোটপত্রিকাকে কেন্দ্র করে। 'অনিশ' ও 'শতক্রতু' পত্রিকার সঙ্গে আরো অনেক পত্রিকা বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্পের আলোচনায় দেবব্রত চৌধুরী একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

দেবব্রত চৌধুরীর ১২টি গল্প সংকলিত একমাত্র সংকলন গ্রন্থ 'আব্বাজানের হাড়' এর গল্প গুলির রচনাকাল ১৯৮০ সাল থেকে ২০০২ সাল। তাঁর গল্পবিশ্ব সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় তাঁর গল্পে সমকালীন সময় ও সমাজের কথা বিশেষভাবে স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর গল্পে যাদের কথা উঠে আসে তারা মূলত সমাজের দলছুট মানুষ।

তিনি বরাক উপত্যকার ব্রাত্য ও প্রান্তিকায়িত সমাজজীবন কে তাঁর বয়ানের আধেয় করে তুলেছেন। ২০১৭ সালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন তাঁর গল্পে তিনি যে সময়ের, যে সমস্যার কথা বলেছেন বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা এর থেকে ঠিক কতটা উত্তরনের পথ খুঁজে পেয়েছি? নাকি সেই সমস্যা গুলো আজও সমান প্রাসঙ্গিক। আমরা কীভাবে এর থেকে উত্তরনের পথ খুঁজে পেতে পারি, গল্পকার কি তাঁর গল্পে কোনোভাবে, কোনো ইঙ্গিতে এর থেকে উত্তরনের পথ বলে দিয়েছেন? –এইসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানেই আমার বর্তমান এই প্রবন্ধ।

গবেষণায় আমরা দেখেছি গল্পকার দেবব্রত চৌধুরী সম্ভবত একটাও গল্প পুরোপুরি মূলস্রোতের জীবন নিয়ে লিখেন নি। তাঁর গল্পের প্লট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রন্ত জীবন নির্ভর। অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল একটি পরিবারের বা সমাজের জীবন-সমস্যা, তাদের যে টানাপোড়েন-এ সমস্তেরই বাস্তবসম্মত রূপ প্রতিফলিত হয় তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে। তাঁর গল্পে নেলী হাঙ্গামা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, বাস্তুহারাদের মর্মবেদনা ইত্যাদি প্রেক্ষিত হিসেবে উঠে এসেছে। দেবব্রত চৌধুরী 'অপর' অস্তিত্বের এক নিপুণ কথাকার। এই প্রান্ত জনদের নিয়ে রচিত গল্প গুলির মধ্যে দেবব্রত চৌধুরী একটু আশার ইঙ্গিতও দেন। সেই আশায় তাঁর গল্পের চরিত্ররা বেঁচে থাকে, লড়াই করে সেই আশা পুরনের জন্য। তাদের যে

আশা পূরণ করান দেবব্রত চৌধুরী এমন নয়। আসলে সময় ও সমাজের মধ্যে থেকে নির্মাণ করা চরিত্রকে সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সাফল্যের স্বাদ দিতে চান না দেবব্রত চৌধুরী। বাস্তব প্রেক্ষিতে একটা চরিত্র যতটুকু করতে পারে ঠিক ততটুকুই তিনি তাঁর গল্পের চরিত্র কে অংকন করেন। তুলে ধরেন সময় ও সমাজের বাস্তব সম্মত রূপ।

Discussion

বাংলা সাহিত্য ধারার একটি গতিশীল এবং সমৃদ্ধতম শাখা বাংলা ছোটগল্প। এই ছোটগল্প কোন ঘটনার বিবরণ, নীতি শিক্ষা বা রূপক রচনা থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি। আধুনিক সাহিত্যের এই রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি উনিশ শতকে, আমেরিকায়। ছোটগল্পের প্রথম চার প্রবর্তক রূপে আমরা যাদের নাম পাই তারা হলেন গী-দ্য-মোপাসা, এডগার অ্যালান পো, নাথানিয়েল হর্থন, নিকলাই গোগোল। বাংলা সাহিত্যে যথাযথ ছোট গল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত পূর্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতি' (১২৮০ বঙ্গাব্দ) নামক গল্পকে অনেক সমালোচক প্রথম বাংলা ছোটগল্প বলে চিহ্নিত করলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) থেকেই সার্থক ছোটগল্পের সূচনা হয়।

বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র ও সমৃদ্ধতম শাখার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা এক কথায় দেওয়া যায় না। যায় না কারণ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন অনেকে। বিভিন্ন জনের কাছে বিষয়টি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোট গল্পের একটি রূপ তুলে ধরেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ভাবেন -একটি ক্ষুদ্র আখ্যান খন্ডে সম্পূর্ণ জীবনের তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য। এডগার অ্যালান পো আধঘন্টা থেকে এক-দু ঘণ্টার মধ্যে এক বসায় পড়ে ফেলা যায় এমন গদ্য আখ্যানকে বলেন ছোট গল্প। আবার জেমস এর মতে ছোট গল্প হবে তীক্ষ্ম এবং দ্রুতলয়ের। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অনেক পরিবর্তন। আঙ্গিক, রচনা কৌশল, ভাষা প্রয়োগ, কাহিনী বিন্যাস ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সূচনা লগ্ন থেকে বহুপথ পেরিয়ে বাংলা ছোটগল্প আজ ফলে ফুলে সমৃদ্ধ।

বরাক উপত্যকায় বাংলা ছোটগল্পের চর্চা শুরু হয় মূলত ছোটপত্রিকাকে কেন্দ্র করে। 'অনিশ' ও 'শতক্রতু' পত্রিকার সঙ্গে আরো অনেক পত্রিকা বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্পের আলোচনায় দেবব্রত চৌধুরী একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

গল্পকার দেবব্রত চৌধুরী সম্ভবত একটাও গল্প পুরোপুরি মূলস্রোতের জীবন নিয়ে লিখেন নি। তাঁর গল্পের প্লট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রন্ত জীবন নির্ভর। অর্থনৈতিক ভাবে অসচ্ছল একটি পরিবারের বা সমাজের জীবন-সমস্যা, তাদের যে টানাপোড়েন- এ সমস্তেরই বাস্তবসম্মত রূপ প্রতিফলিত হয় তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে। তাঁর গল্পে নেলী হাঙ্গামা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, বাস্তহারাদের মর্মবেদনা ইত্যাদি প্রেক্ষিত হিসেবে উঠে এসেছে। অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্যের কথায়, -

> "দেবব্রত চৌধুরী 'অপর' অস্তিত্বের এক নিপুণ কথাকার।"[১]

লেখক জীবনের শুরুতে আকাশবাণীর মৌলিক নাটক প্রতিযোগিতায় দেবব্রত চৌধুরীর যোগদান এবং পুরস্কার প্রাপ্তি ছিল নিয়মিত। বিশ শতকের আশির দশকের শেষদিকে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন আয়োজিত প্রথম ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় দেবব্রত চৌধুরীর 'সাধভক্ষণ' গল্পটি শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করে। এই 'সাধভক্ষণ' গল্পটি যখন আবার বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের এক গল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংকলনটির আলোচনা করতে গিয়ে সাহিত্য অকাদেমীর কলকাতা শাখার তৎকালীন আঞ্চলিক সচিব শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় গল্পটিকে প্রেমচান্দের গল্প ধারার স্বগোত্রীয় বলে বিশেষ প্রশংসাও করেছিলেন।

'সাহিত্য', 'প্রতিশ্রোত', 'পূর্বদেশ', 'মুখ', 'সোনার কাছাড়', 'অক্ষরবৃত্ত' ছাড়াও উত্তর-পূর্বের অনেক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে কলকাতা ও বাংলাদেশের কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে দেবব্রত চৌধুরীর গল্প। তাঁর ১২টি গল্প সংবলিত একমাত্র সংকলন গ্রন্থ 'আব্বাজানের হাড়' ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়। সংকলন গ্রন্থটি সম্পর্কে রণবীর পুরকায়স্থ এর অভিমত, -

> "উত্তরপূর্ব ভারতে বাঙালির অস্তিত্ব সংকটে বিশল্যকরণীর কাজ করবে বারোটি গল্পের এই সংকলন। গল্প গ্রন্থ 'আব্বাজানের হাড়' এক মমতাহীন মমত্বের প্রামাণ্য দলিল হয়ে থাকবে বাংলা সাহিত্যে।"[২]

বাংলা ছোটগল্পে আমরা চিরকালই জীবনের নানা বাস্তবতাকে প্রতিফলিত হতে দেখেছি। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভঙ্গি কিংবা আঙ্গিক বদলেছে বারবার কিন্তু জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা বদল হয়নি। আমরা জানি, বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস ভীষনই এক সমৃদ্ধ ধারার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে - এই সমৃদ্ধি আসলে জীবন বাস্তবকে ছুঁয়ে দেখার তীব্র আকুতি থেকে জন্মেছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বাংলা ছোটগল্প চর্চায় যে মহান শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা কেউই জীবনের নানা মাত্রা কে অস্বীকার করেননি; সেখানে একদিকে যেমন ব্যক্তি মানুষের সংকটের কথা উঠে এসেছে, ঠিক তেমনি সমষ্টিগত ভাবে মানুষের লড়াইয়ের নানা দিক উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে যেমন আমরা নর-নারী প্রেমের স্বাভাবিক উৎসার লক্ষ করি, ঠিক তেমনি জীবনের প্রেমহীনতাও সমান গুরুত্ব পেয়েছে, আর কখনো কখনো সবকিছুকে ছাঁপিয়ে আমাদের গল্প লেখকরা রূপ দিয়েছেন আরো বৃহত্তর সঙ্কটকে। এক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সংকট কীভাবে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে তার ছায়াপথ গল্পে অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায়। আবার অন্যদিকে সমাজে একশ্রেণীর মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার যন্ত্রনা, একাকিত্বের গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া হৃদয়বিদারী কাহিনি আমাদের গল্প সাহিত্যে অবলীলায় স্থান করে নিয়েছে।

দেবব্রত চৌধুরীর গল্পের আলোচনায় এই বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই ভাবায়। গল্প বস্তুর বৈচিত্র্য তাঁর লেখায় আমরা খুঁজে পাই। কিন্তু দেবব্রত যেন গল্প রচনার ক্ষেত্রে নিছক সাধারণ বিষয়কে আঁকড়ে ধরেন না, তাঁর রচনায় প্রায়শই প্রধান হয়ে ওঠে আমাদের সমাজের সেই সব মানুষের কথা যারা ভীষণভাবে একক, যারা ভীষণভাবে বিচ্ছিন্ন, যারা ভীষণভাবে বৃহত্তর সামাজিকতার মার সহ্য করেছেন। দেবব্রতর গল্পগুলো পড়ার পর আমাদের অবধারিতভাবে মনে হয় তিনি সেইসব প্রায় বিছিন্ন, নির্বাসিত মানুষের সঙ্গে কোথাও না কোথাও একাত্মতা বোধ করেছিলেন, সুতরাং তাঁর লেখায় সেই সব চরিত্র যে ভীষণভাবে জীবন্ত হয়ে উঠবে তা খুবই স্বাভাবিক। এই প্রান্তিকতা কখনো অর্থনৈতিক বৈষম্যজাত, কখনো পেশাগত, কখনো অমানবিকতার গর্ভ থেকে জাত, আবার কখনো নিছক ব্যক্তি মানুষের অসহায়তা থেকে উদ্ভূত।

দেবব্রত চৌধুরীর গল্পে আমরা যাদের কথা পাই তারা বরাক উপত্যকার মধ্যে থাকা প্রান্তিক। যারা সংখ্যায় বেশি, যাদের সংগ্রাম প্রতিনিয়ত, যাদের বন্যায় ভুগতে হয়, যাদের অনাহারে দিন কাটাতে হয় নয়তো খাদ্যের খোঁজে যেতে হয় অনেকটা দূর, যাদের ভিক্ষা করে জীবন চলে, যারা কখনো সাপের খেলা দেখায়, কখনো দেহজীবি, কখনো পকেটমার, কখনো চা শ্রমিক, যাদের প্রমাণ দিতে হয় আইডেন্টিটির, যাদের জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ঘরবাড়ি, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যাদের বেরিয়ে আসতে হয় আশ্রয় শিবিরে বাইরে - এমন সব প্রান্তজনের কথা উঠে আসে তাঁর লেখায়। দেবব্রত চৌধুরীর প্রায় সবগুলি গল্পই বরাক উপত্যকার জনজীবন নিঙড়ে উঠে আসা লোহিত স্রোত। এই সব প্রান্তবাসী চরিত্রের উপরে তার সহানুভূতি ঝরে পড়েছে। 'বেদনার সন্তান' দেবব্রত চৌধুরীর গল্পে আমরা সেই সকল মানুষকে পাই যাদের বেদনা আমাদের কাঁদায়। সে মানুষ কখনো চোরের মা, কখনো পকেটমার, কখনো পিতার কঙ্কাল বিক্রি করতে আসা বিপন্ন সংখ্যালঘু নাগরিক, কখনো এমন এক গরীব ব্রাহ্মণ যার জীবিকাই হল শ্রাদ্ধ বাড়ির নিমন্ত্রণ খাওয়া, কখনো এক বিস্মৃত গণশিল্পী, কখনো মাছ মারা জেলে, কখনো বন্যাক্রান্ত হঠাৎ উদ্বাস্তু।

অপর অস্তিত্বের নিপুন কথাকার দেবব্রত চৌধুরী একটিও গল্প পুরোপুরি মূলস্রোতের জীবন নিয়ে লিখেন নি। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পেই উঠে এসেছে প্রান্তিক জনজীবনের চিত্র। তাঁর 'চোরাঘূর্ণি' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র দাদনের

বেড়াজালে আটকে পড়া চাতলার মাছমারা নীলকন্ঠ। নীলকন্ঠ, দুধনাথ, হাজিম মিয়া এদের মধ্য দিয়ে দেবব্রত চৌধুরী পাঠকের সামনে তুলে ধরেন জেলে জীবনের দারিদ্রতার ছবি।

চাতলার জলে মাছ মারতে এসে নীলকন্ঠ হঠাৎ চিন্তাগ্রস্থ হয়ে ওঠে। কেননা তার বাচ্চা ছেলে নয়ান অনেকদিন ধরে অসুস্থ। মেডিকেলের ডাক্তারের কথায় অপারেশন লাগবে নয়ানের। তার জন্য খরচ যাবে পাঁচশো টাকা। কিন্তু মাছ মারা নীলকন্ঠ সেই টাকাই একসঙ্গে করতে পারেনা। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য পুত্রের চিকিৎসা করতে না পারা, তাকে দিন দিন মৃত্যুপথে এগোতে দেখা যে কি নির্মম পাঠক মাত্রেই তা উপলব্ধি করতে পারেন।

নিজস্ব জাল কেনার মতো স্বচ্ছলতা নেই বলেই এই চরিত্রগুলো কাজ করে অন্যের জালে। হরিণ টিলার ক্ষীরোদ আড়াই হাজার টাকার বেড়াজাল তুলে দেয় নীলকণ্ঠের হাতে। দিনে দশ টাকা সুদে যেদিন সে ক্ষীরোদকে জালটার পুরো দাম দিয়ে দিতে পারবে সেদিন থেকেই জালের মালিক হবে নীলকন্ঠ। আশায় আশায় নীলকন্ঠ প্রথমে জাল নিয়ে খুশি হলেও চক্রবৃদ্ধি হারের অন্য এক চোরাঘূর্ণিতে সে জড়িয়ে পড়ে ক্রমশ।

'কাক' গল্পে ছেষট্টি বছরের বৃদ্ধ ধীরুঠাকুরের শেষ সম্বল এক শ্মশান ডোম ধনিয়ারামের খড়ের চালা। যার অবস্থা খুবই দুর্দশাগ্রস্থ। চারধারের পুরোনো বেড়া আর দরজা এতটাই জীর্ণ আর নামমাত্র যে কুকুর, ছাগল আর ডোমদের পোষা শুয়োর সেই ঘরে অনায়াসে চলে আসতে পারে। ধীরু ঠাকুর হাঁপের রোগী। তার শ্বাস নিতে যেমন ভীষণ কষ্ট হয় তেমনি বিছানা থেকে উঠে বসতে বাত যন্ত্রণা থাকে কাতর করে তুলে। কিন্তু এতকিছুর পরও এই সহায়-সম্বলহীন ধীরুঠাকুরের খাদ্য সংস্থান তাকেই করতে হয়। ধীরু আহার সন্ধানের তাগিদ বাতযন্ত্রণা বা শ্বাসকষ্ট কে অগ্রাহ্য করেন। গল্পকার ধীরুঠাকুরের খাদ্য সংস্থানের যে বর্ণনা দেন তা খুবই মর্মভেদী। গল্পে আমরা দেখি ছানিপড়া চোখে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এই বৃদ্ধ এবং আকাশে উড়ে বেড়ানো কাকপক্ষীর চলাচল দেখে নিশ্চিত করেন তার সেদিনের খাদ্য সংস্থান। পৌঁছে যান শ্রাদ্ধ বাড়িতে। তাইতো পাড়ার বাচ্চাদের কাছে তিনি পরিচিত হন 'কাউয়া ঠাকুর' নামে।

দুর্বলতার জন্য যখন তিনি কোথাও বেরোতে পারেন না তখন ডোম ধনিয়ারামের স্ত্রী পূরবী তাকে এনে দেয় খাবার। প্রথম ব্রাহ্মণ হয়েও ডোম পরিবারের হাতের খাবার খেতে সংকোচ বোধ হলেও ক্রমে সেই সংকোচতা কেটে যায় এবং পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি তাদের মধ্যে এক পরম আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে।

ধীরুঠাকুর যখন কোথাও বেরোন না তখন শ্মশানে আসা শব যাত্রীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। তাদের দুঃখ যাচাই করে নিয়ে তারপর মনে মনে হাসেন ধীরুঠাকুর কেননা তার হাতের মুঠোর ভেতর তখন চলে আসে আরেকটা দিনের অন্নগ্রাস। আবার এই কাজ যে ধীরুঠাকুর খুব খুশি হয় করেন এমনও নয়। শাস্ত্রজ্ঞান দিয়ে সব যাত্রীদের থেকে শ্রদ্ধা করেন ঠিক কিন্তু, -

> "নিজের জন্য বড় দুঃখ হয় ধীরুঠাকুরের। এই সব কথার কৌশলে, জ্ঞান দানের বিণিময়ে তাঁর আরেক দিনের অন্ন রোজগার করতে হয়। জানতে হয় শবের পরিচয়। বাড়ির ঠিকানা, শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার বার তারিখ। শ্রাদ্ধক্রিয়া প্রাপ্যতা ন-দক্ষিণা হিসেবে এবং সদ্গতি ভোজের বহর।"[৩]

এখানে একজন মানুষের মৃত্যু যেন অন্য একজন মানুষের বেঁচে থাকার সম্বল। একজনের শ্রাদ্ধের ভোজ অন্য আরেকজনের একদিনের অন্নসংস্থান। লেখক দেবব্রত এমন সব প্রান্তিকায়িতদেরই তাঁর ছোটগল্পের আধেয় করে তোলেন। তুলে ধরেন তাদের জীবনের সংগ্রামকে।

'সাধভক্ষণ' গল্পে দেখি অবন্তীর সাধভক্ষণ হচ্ছে পঞ্চাশোর্ধ শাশুড়ি দাক্ষীর রাজপুরের এক বিত্তশালী ব্যক্তি সরকার বাবুর মায়ের আত্মার সদগতির জন্য দেওয়া কাঙ্গালী ভোজ দিয়ে। দাক্ষী সেই ভোজ নিজে না খেয়ে সন্তানসম্ভবা পুত্রবধূ অবন্তীর জন্য গামছা বেঁধে নিয়ে আসেন কেননা, -

> "ঘরে চাল বাড়ন্ত। পোয়াতি বউটা কদিন থেকে শুধু শাকপাতা চিবুচ্ছে। অথচ এ সময়ে খাওয়া প্রয়োজন।"[৪]

দাক্ষীর স্বামী জগাই দাস বা ছেলে সুধীন্দ পরিবার চালনার জন্য যে পেশা-কে অবলম্বন করে তা নিতান্তই প্রান্তিক। তারা ভদ্র সমাজে ব্রাত্য। এক সময়ের দাগি চোরের ছেলে সুধীন্দ কেও আমরা এক জেল খাটা দাগি চোর হিসেবে দেখতে পাই। চুরি করেই তাদের জীবনযাপন। লেখক দেবব্রত গল্পের মধ্য দিয়ে এই চোরের পরিবারেরও ভালো হওয়ার আশা কে তুলে ধরেন। এক সুস্থ জীবনযাপনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন।

গল্পে আমরা জানতে পারি শহরের এক বড় বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে সধিন্দ ধরা পড়ে যায় এবং সেখানে পাড়াসুদ্ধ মানুষের তুলধুনাই, লাঠি, রডের আঘাতে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া সুধিন্দকে কাছে সমঝে দেওয়া হয় এবং ভোরের দিকে থানার লকাপেই সুধিন্দ মারা যায়। পুত্রের রক্তাক্ত লাশের উপর দাক্ষী সেদিন বুক ফাঁটিয়ে কান্না করেছিলেন।

ঘটনার ঠিক একদিন পরেই দেখা দেয় সংসারের অচলাবস্থা। দাক্ষী এবং তার পোয়াতি বউ অবন্তীর ভাতের জোগাড় হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। প্রথম দু'একদিন আত্মীয়রা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও পরবর্তী সময়ে তারা হাত গুটিয়ে নেয় আর সে জন্যই সুধীন্দের মৃত্যুর এগারো দিন পর তাদের খাবার জোটে 'শাকপাতা আর কাঁঠাল বিচি সেদ্ধ'।

এমন অচলাবস্থায় রাজপুরের সরকার বাবুর মায়ের সদগতির জন্য দেওয়া কাঙালী ভোজের নিজের অংশটুকু পুত্রবধূর জন্য নিয়ে এসে দাক্ষী যখন সাধভক্ষণ এর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, -

> "ইদিনকা খাওয়ন লাগে, পেডোরটা আভাইত্যা অয় না।"[৫]

এবং পরবর্তী সময়ে যখন দাক্ষী, অবন্তীকে খাওয়ানোর জন্য বলে ওঠেন, -

> "ইডিন তোর লাইগ্যা নায়, যিডা আইত্যাছে হিডার ...তুই হাদ না খাইলে হিডানু আভাইত্যা অইয়া চুর চামারোর জন্ম লইব।"[৬]

- তখনই দাক্ষীর কথায় প্রকাশ পায় পরবর্তী প্রজন্মের এক সুস্থ জীবন যাপনের কামনা। এমন জীবন থেকে সরে এসে পরবর্তী প্রজন্ম যেন জন্য একটু সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে এই আশায়ই দাক্ষী সাধভক্ষনের প্রতি জোর দেন। অবন্তীকে খাওয়ানোর জন্য এতেদূর থেকে নিয়ে আসেন পঞ্চ ব্যঞ্জন। দেবব্রত চৌধুরী এভাবেই তাঁর গল্পে নানা ভাবে তুলে ধরেন এই প্রান্তবাসী দের জীবন চিত্র, তাদের জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে তিনি কোথাও না কোথাও একাত্মতা বোধ করেন এবং সেজন্যই তাঁর লেখনীতে এই প্রান্তজনদের যাপিত জীবনের দুঃখ-দূর্দশার চিত্র বাস্তবসম্মতভাবে উঠে আসে।

'রাতের প্রহরী' গল্পে আমরা চা বাগানের শ্রমিক শ্রেণীর জীবন যাপনের একটা চিত্র পাই। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, চিকিৎসার অভাব, পেটের দায়ে ছোট ছোট নিত্যদিনের আনন্দে ভাটা এসব উঠে আসে ভুবনচড়া বাগানের 'নাইট গাট' অর্থাৎ নৈশ প্রহরীর মধ্য দিয়ে।

দশ বছর থেকে বড় বাংলার রাত-চৌকিদার এই কালীচরণ মাহালি। ঝড়-তুফানের মধ্যে রাতদিন নির্বিশেষে তাকে প্রহরে প্রহরে ভুবনচড়ার বাগানের মানুষকে সময় জানান দিতে হয়। সময় জানান দিতে থাকে খাট্টা গাছের দিকে আসতে হয়। যে খাট্টা গাছকে কেন্দ্র করে তার মনে হয় ভয় জাগ্রত হয়। তবু পেটের দানা জোগাতে, জেগে থাকার, বেঁচে থাকার খবর জানাতে তাকে এখানেই আসতে হয়। এখানেই তাঁর কর্ম নিশান।

বাগানে দেওয়ালির উৎসবে যখন সকলে আনন্দে মেতে ওঠে। নাচঘরে যাত্রাপালা হয়। কলকাতার বাসন্তি অপেরা 'নাচ ঘরের কান্না' পালা করে, বাগানে মেলা বসে, সকলে পালা দেখে, মেলায় যায়, আনন্দ করে তখন কালীচরণ কে তার 'ডিপটি' সামলাতে হয়।

এই আমোদে অংশীদার হতে না পেরে কখনো কখনো তার মনে দুঃখও জাগে। এই প্রহরীর কাজ ফাঁকি দিয়ে সেও চলে যেতে চায় আমোদে সামিল হতে। কিন্তু তার প্রতি যে বিশ্বাস দেখিয়েছে কোম্পানি ,কোম্পানির খাস মানুষ রামকুমার জৈন, সেই বিশ্বাসকে অমর্যাদা করতে পারে না। তাই বাগানের মালি বাগিরাম, গরু-মুরগি-খরগোশ বাগাল পাতিলাল ও এমনকি তার স্ত্রীর দুধপাতিলা ও দুই কন্যা উপনি আর টুপনিও যখন নাচঘরে মগ্ন তখন কলীচরণ 'ডিপটি' সানলায়। পেটের দায়ে তার স্ত্রীও বাগানের কাজে নিযুক্ত। তাদের একসঙ্গে থাকার সুযোগ হয় না খুব একটা। কেননা কালীচরণের কাজ রাতের দিকে আর দুধ পাতিলার সারাদিন থাকে কামজারি। তাই অসুস্থতার ছুটি ছাড়া তাদের

একসঙ্গে থাকা হয়ে ওঠেনা। বেঁচে থাকার তাগিদে, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাটুকু দূরীকরণের তাগিদে, এই বিচ্ছেদটুকু তাদের মেনে নিতেই হয়।

'মুখচ্ছবি' গল্পে আমরা যে সকল চরিত্রের হদিস পাই তাদের মধ্যে একজন নামহীন ভিখারি যার জন্মদাতার কোনো পরিচয় নেই। অন্যজন সাপের খেলা দেখানো নাগমতি আর একজন সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকে বিক্রি করা মনা। এই প্রত্যেকটি চরিত্রই অবস্থানগত দিক থেকে প্রান্তিক। গল্পটিতে দেবব্রত জন্ম পরিচয় হীন খোঁড়া ভিখারির জীবনযাত্রার ছোট্ট অথচ গভীর পরিচয় তুলে ধরেন। সে বুঝতে পারে যে সে কোনো আলালের ঘরের দুলাল নয় বরং কোনো এক আলালের ঘরের দুলালির খামখেয়ালীর ফসল। বাঁচার তাগিদে লোকটা তার খোঁড়া পা এগিয়ে দিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। দিনান্তে এসে তার ভিক্ষার পাত্রে কখনো খুচরো পয়সার একটা ক্ষুদ্র তহবিল হয়। আবার কখনো টাকা দুয়েক - কিংবা 'একদম খাঁ খাঁ শূন্য'। দিনের শুরুতে ক্ষুধা নিবারনের জন্য দোকানির ফেলে দেওয়া টকটক গন্ধ যুক্ত বাঁশি পাউরুটি আর সারাদিন ভিক্ষার মধ্যে ক্ষিদে পেলে পৌরসভার জলের ট্যাঙ্ক থেকে পেট ভরে জল খেয়ে নেওয়া তার যাপনের অঙ্গ।

'যেহেতু জীবিত' গল্পে আমরা পাচ্ছি এমন দুটি চরিত্র যাদের সামাজিক মান নেই বললেই চলে। একজন পকেটমার আর অন্যজন দেহজীবি। এই দুটি চরিত্র যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল দিক থেকেই প্রান্তিক। তাদের মধ্যে এক সময় খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক ছাড়িয়ে প্রেমের জন্ম হওয়ার দিকটাও গল্পকার গল্পটিতে তুলে ধরেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি পকেটমারের তাঁর প্রেমিকাকে বাঁচাতে মা মরা ছেলেটির পকেট থেকে টাকা চুরি করার পক্ষে যুক্তিও দেন- 'মৃতের চেয়ে জীবিতের জন্য পৃথিবীতে বেশী দাম'।

একজন পকেটমার ও একজন দেহজীবির চোখ দিয়ে গল্পকার তাদের জীবনকে দেখেন তাই তাঁর গল্পে উঠে আসে এত কিছুর মধ্যেও তাদের একটু ভালোভাবে জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষার কথা। পকেটমার বা দেহজীবির বাইরে তারাও যে মানুষ তাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা এ সবই গল্পটিতে উঠে আসে ছোট ছোট কথার ফাঁকে। প্রবল ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তেও চিনির, শিবুর কাছে কাঁদো কাঁদো গলায় থাকে সেই ভালোভাবে বাঁচারই আর্তি –

> "...পারিনা শিবু... আমি আর এভাবে পারিনা... এমন জীবন আর কতদিন... ভাল্লাগেনা... তুমি আমাকে বাঁচাও শিবু।"[৭]

- দেহ জীবিকা ছেড়ে দিয়ে এবার শিবুর সঙ্গে বিয়ে করে এক সুস্থ জীবনের কামনা উঠে আসে তার কথায়। অন্যদিকে শিবুর ভাবনায় প্রতিফলিত হয় এ নিয়ে তার অসহায়তার কথা, -

> "আচ্ছা আমার ওপর চিনির এত প্রত্যয় কেন? চিনি তো জানে আমি কী, আমার পেশা, আমার গতিবিধি এমনকি নিয়তিও চিনি অনুমান করতে পারে। তবে কেন সে আমাকেই নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে! কী নিরাপত্তা আমি দিতে পারি ওকে? সামান্য ভুলের জন্য আজীবনের মাশুল পর্যন্ত গুনতে হতে পারে আমাকে, দু'আঙুলের কাজে একটু ভুল হয়ে গেলেই যে রাজ্যের পাবলিকের আক্রোশ নিতে হবে- এই তো জীবন- চিনি কি জানেনা? তবু কেন ফুটো নৌকায় আরোহী হতে চায় সে?"[৮]

- এই অসহায়তা আসলে এরকম হাজার হাজার মানুষের, যারা নিরাপত্তাহীন। যাদের সারাটা জীবন কেটে যায় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে। পকেটমার শিবুও বুঝতে পারে না যে চিনি সমস্ত জেনে শুনেও কেনো তার সঙ্গেই ঘর বাঁধতে চায়, স্বপ্ন দেখে এক সুস্থ জীবনের।

অর্থনৈতিক অপ্রতুলতা নিঃসন্দেহে দেবব্রত চৌধুরীর গল্পের সিংহভাগ জুড়ে আছে। তিনি প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রামের এক দরদী রূপকার। তাঁর গল্পে আমরা দেখি এই প্রান্তিকদের নেই কোন আলাদা বর্ণ, নেই কোন আলাদা ধর্ম। তাঁরা বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষেই প্রান্তিক। এরই সঙ্গে আমরা অন্য আরেক প্রান্তিকের হদিস পাই তাঁর 'ভূখানৃত্য' গল্পে। 'ভূখানৃত্য' গল্পে দেখি যে রাজনীতি একটা সময় ছিল সর্বহারার রাজনীতি। যে রাজনীতির মধ্যে একটা সময় সর্বহারার স্বর শোনা যেত। পরবর্তী সময়ে তার চেহারাও পাল্টে যায়। সে তখন আর সর্বহারার না থেকে হয়ে ওঠে

অন্য শ্রেণীর, তার আচরণেও এর ছাপ স্পষ্ট হয়। রাজনীতি হয়ে ওঠে অন্তঃসারশূন্য দেখনদারি। তখন যে মানুষটা এক সময় এই 'ভূখানৃত্যে'র দলের একজন ছিল, যুক্ত ছিল খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে, সে নিজেকে এই শহরে জৌলুসে খাপ খাওয়াতে পারে না। নিজেকে প্রান্তিক ভাবে, আড়ষ্ট হয়। তার অস্তিত্ব হয়ে ওঠে অপ্রাসঙ্গিক। গল্পটিতে মূল যে বিষয়টি লেখক তুলে ধরেন তা হচ্ছে একটি আন্দোলনের যারা একটা সময় মূল কান্ডারী ছিল তারাই পরবর্তী সময়ে হয়ে ওঠে প্রান্তিক। সাংস্কৃতিক আন্দোলন তখন আর আন্দোলন থাকে না। যাদের জন্য এই সংস্কৃতি বা এই আন্দোলন তারাই হয়ে ওঠে সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। তাই 'ভূখানৃত্য' গল্পে সেই রমণীমোহন গ্রাম থেকে এই অনুষ্ঠানে এসে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন না। সংকুচিত করে ফেলেন নিজেকে। এই আইডেন্টিটির সংকট দেবব্রত চৌধুরীর 'আব্বাজানের হাড়- একটি প্রামাণ্য দলিল গল্পেরও মূল বিষয় এখানে ব্যক্তি আমিরুদ্দি আসলে সমষ্টি প্রতীক।

লেখক খুবই সহজ সরল ভাষায় ব্যক্তি আমিরুদ্দির মাধ্যমে বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক এমন একটি জ্বলন্ত সমস্যার কথা কে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। ভোটাধিকার থাকা সত্ত্বেও দেশীয় নয় এমন সন্দেহের সমন হাজার হাজার আমিরুদ্দির সংকট পূর্ণ জীবনে এক উটকো সংকট। এই সংকট থেকে মুক্তি আমিরুদ্দিরা পাবে কি না সে বিষয়ে লেখক কিছু বলেননি। বলা সম্ভবও নয়। এই আমিরুদ্দিরা অভাগা। তারা যেদিকেই যায় সেদিকেই এক সংকট তাদের ধাওয়া করে, শুকিয়ে যায় সাগর। তারা পায় না খানিক স্বস্তিও।

প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রামের এই দরদী রূপকার এর লেখা কিছু গল্পের শেষে কিন্তু একটা আসার ইঙ্গিতও লক্ষিত হয়। মনে হয় দেবব্রত চৌধুরীর গল্পের কুশীলবেরা যেন অন্ধকারে থেকেও আলোর পথের সন্ধান করে। "চোরাঘূর্ণি" গল্পের 'দুধনাথ' একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে মাছ টাকে ছেড়ে দেয়। এই মাছ ছেড়ে দেওয়ার পেছনে আছে দাদনের বিরুদ্ধে তার একটা প্রতিবাদ। এই মাছের মুক্ত হওয়ার পেছনে চক্রবৃদ্ধি হারের সুদের কবল থেকে তার নিজের মুক্তিলাভের বাসনা কাজ করছে বলে আমাদের ধরে নিতে অসুবিধা হয় না। 'সাধভক্ষণ' গল্পের শেষদিকে বৃদ্ধা দাক্ষি তার সন্তান সম্ভবা পুত্রবধূ অবন্তিকে সাধভক্ষণ করান। কেননা তিনি চান না যে তার স্বামী জগাই দাস কিংবা ছেলে সুধীন্দ এর মতো এই নবাগত সন্তান চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করুক। তার বক্তব্যে স্পষ্ট হয় আর অন্ধকারের জীবন নয় এবার আলোর দিকে পা ফেলার চেষ্টার কথাকে। 'যেহেতু জীবিত' গল্পের চিনিও তো এই জীবন আর চায়না শিবুকে তাই তার অনুরোধ 'আমাকে বাচাও শিবু'। 'কথকঠাকুর' গল্পের জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রথমদিকে তাঁর লেখা না ছাপানোয় আড়ষ্ট হন বটে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন তার সেই গল্প বলার ভঙ্গিতে অসুস্থ জাইমুন সুস্থ হয়ে ওঠে তখন মনের কালো মেঘ কেটে গিয়ে পরিষ্কার আকাশ দৃষ্ট হয় তাঁর কাছে। তিনি ও খুঁজে পান নিজেকে।

দেবব্রত চৌধুরীর 'ভূখানৃত্য' গল্পটিও এর ব্যতিক্রম নয়। গল্পে একই সঙ্গে উত্তর ঔপনিবেশিক চেতনার একটি পাঠও লক্ষিত হয়। ঔপনিবেশিকতার যে একটি লক্ষণ বিস্মৃতি সেই বিস্মৃতি থেকে তাকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে উত্তর ঔপনিবেশিক চেতনার একটি বৈশিষ্ট্য। 'ভূখানৃত্য' গল্পের কুশীলব রমণীমোহন গণসংস্কৃতি কে এই দেখনদারির ব্যাপার থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে দেখতে চান তার প্রকৃত রূপে। তাইতো গল্পের শেষে দেখি তিনি গান্ধীবাগে হালকা আলোর মধ্যে একাই মা ও মৃত্যু দুইয়ের ভূমিকায় নৃত্য জুড়ে দেন। যা রক্তে মাতন ধরায়। নাতি বিল্ল সহ অন্যান্য অনেক খেটে খাওয়া মানুষ সেখানে জড়ো হয়। যাদের জন্য এই প্রচেষ্টা তাদের জড়ো হওয়া তো একটা ইতিবাচকতারই ইঙ্গিত দেয়। এই প্রান্ত জনদের নিয়ে রচিত গল্প গুলির মধ্যে দেবব্রত চৌধুরী একটু আশার ইঙ্গিতও দেন। সেই আশায় তাঁর গল্পের চরিত্ররা বেঁচে থাকে, লড়াই করে সেই আশা পুরনের জন্য। তাদের যে আশা পূরণ করান দেবব্রত চৌধুরী এমন নয়। আসলে সময় ও সমাজের মধ্যে থেকে নির্মাণ করা চরিত্রকে সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সাফল্যের স্বাদ দিতে চান না দেবব্রত চৌধুরী। বাস্তব প্রেক্ষিতে একটা চরিত্র যতটুকু করতে পারে ঠিক ততটুকুই তিনি তাঁর গল্পের চরিত্র কে অংকন করেন। তুলে ধরেন সময় ও সমাজের বাস্তব সম্মত রূপ।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, বিমলানন্দ (সম্পাদিত), "বর্ণমালা" (দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা), সাধনা প্রেস, বর্ধমান, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২১৪
২. চৌধুরী, দেবব্রত, "আব্বাজানের হাড়", সৃজন গ্রাফিক্স অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর,২০১৬, পৃ. ৩
৩. চৌধুরী দেবব্রত, "আব্বাজানের হাড়", সৃজন গ্রাফিক্স অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর, ২০১৬, পৃ. ৪২
৪. তদেব, পৃ. ২৯
৫. তদেব, পৃ. ৩২
৬. তদেব, পৃ. ৩৩
৭. তদেব, পৃ. ৭৪
৮. তদেব, পৃ. ৭৯